উৎসর্গ

সেই অজ্ঞাত প্রেমিকার জন্য,
যে হবে আমার জীবনসঙ্গিনী,
চির সুখের জান্নাতে যাওয়ার,
প্রান্ত সফরসঙ্গিনী।
দুনিয়ার সুখের সাথী,
আর দুঃখের ভাগিনী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

কিছু কথা

হে আল্লাহ! প্রশংসা আপনার। আপনি যে আমাদের কলমের সাহায্যে অন্তরের অনুভূতি ব্যক্ত করতে শিখিয়েছেন। রহমত বর্ষিত হোক আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, এবং তার পথের পথিকদের প্রতি।

"গিফট বক্স" — এটি আমার প্রথম বই। কোন এক নিশিতে ঘুমের রাজ্যে পাওয়া একটি স্বপ্নের উপর টেক লাগিয়ে লেখা এই বই। তার উপর সামান্য সাদাকালো রং ছিটানো হয়েছে, কলকব্জা নাড়ানো হয়েছে। সেই স্বপ্নে যেমন ছিল আলোর উদ্ভাস তেমনি ছিল অন্ধকারের ছায়া। যেমনি ছিল ভালো লাগা, ভালোবাসা, তেমনি ছিল অভিমান, রাগের মিশ্র অনুভূতি।

এতে আমি এক দরিদ্র ছেলের জীবন অতিবাহিত করার কথা তুলে ধরতে চেষ্টার হাত ব্যয় করেছি।

আবেগপ্রবণ বা আবেগ-অনুভূতির দাস হয়ে কারো জীবনের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করা,কারো রঙিন জীবন শেষ করে দেওয়া বা কারো উপর ঝড় বয়ে দিয়ে জীবন সংকুচিত করে দেওয়ার কথা বলেছি।

যখন আমাদের কান্না ছাড়া কোনো ভাষা ছিল না, বুকের দুধ ছাড়া খাবার ছিল না — সেই দুর্বল সময়ে যে প্রিয় মানুষগুলো স্বার্থ ছাড়া আশ্রয় দিয়েছিল — রঙিন চশমা চোখে দিয়ে কোনো ছেলে মেয়ের আর মেয়ে ছেলের ভালোবাসায় ডুব দিয়ে মা-বাবার চোখে অশ্রু প্রবাহিত করে শান্তি পাওয়া যাবে না — তা উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করেছি।

বাড়ির আপনজন, গ্রামের সর্বজন — কোনো সত্য-মিথ্যা যাচাই ছাড়া, মিথ্যা ঘটনার উপর বকাঝকা করা বা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মতো কাজে লিপ্ত হওয়া — বিষয়টা অনুমেয় করানোর চেষ্টা করেছি।

জীবনের বাস্তবতা, তিক্ততা এবং আনন্দঘন মুহূর্তগুলো পরিবারের সাথে মিলে উপভোগ করা ব্যতিরেকে জীবন যে কত কষ্টের, কত বেদনার, কতো যন্ত্রণার — তা বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছি।

সকলের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন করা কত আনন্দের তাও জানিয়েছি। সন্তানদের হক আদায় করা, তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া ও নারীর মান-মর্যাদা তুলে ধরতে নিজেকে অভিষ্ট করেছি।

আমি এতে রসাত্মক কথা ও কিছু বাস্তবসম্মত উপদেশাবলি যুক্ত করেছি — যাতে প্রিয় পাঠকবন্ধুগণ কিছু পেতে পারেন এবং বই পাঠে সাচ্ছন্দবোধ করেন। যদিও ডা. আলী তানতাভী বলেছেন -বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা জিনিস হলে কাউকে উপদেশ প্রদান করা।

অবশেষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রিয় বন্ধুদের — যারা আমাকে এই লেখার প্রতি উৎসাহ যোগান দিয়েছে। আরো ধন্যবাদ জানাই বড় ভাই মোঃ রবিউল ইসলাম সিকদারকে — যিনি আমাকে বিভিন্ন সময় উৎসাহ-প্রেরণা দিয়ে থাকেন, এবং এই কাজের প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে সবিনয় আবেদন, নবীন কলম প্রেমিকের নতুন কলম, অসঙ্গতি হওয়াই আসল। যদি হয় অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর, অবগতির করছি অনুরোধ।

ইতি,

রবি ইবনে আখতার

০৪/০৮/২০২৩ ইং

“কোরআন মানুষকে পথ দেখায়, বন্ধুত্ব মানুষকে বদলে দেয়, স্মৃতি মানুষকে কাঁদায়, আর স্বপ্ন মানুষকে জাগিয়ে তোলে।” তাই হোক না! সেই স্বপ্ন আর বাস্তব জীবন নিয়ে কিছু কথা। কিছু সুখের, কিছু দুঃখের, কিছু আনন্দের, কিছু বেদনার, আবার কিছু শখের, কিছু অসুখের কথা।

সবুজ শ্যামল ছায়াবীথি বাংলার এক গ্রামের ছেলে আজাদ। তার পুরো নাম মো. আজাদ হোসেন। ছায়াবাঁশতলা নামের সেই গ্রামখানি যেন রূপকথার জগৎ — নদীর পাড়ে, ইছামতি বিলের কোলে, সবুজের চাদরে মোড়া এক অনন্য ভূখণ্ড। সে তো মমতাময়ী মা — রহিমা বেগমের — আদরে বেড়ে উঠছে। স্নেহশীল পিতা আবু বকর হোসেনের যত্নে বড় হচ্ছে। আজাদ পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান। সে দুষ্ট হলেও ভদ্র, চঞ্চল হলেও মিষ্টি।

আবু বকর হোসেন একসময় হেলিকপ্টার ড্রাইভার ছিলেন। হেলিকপ্টারের পাইলট ছিলেন না। তাঁর জীবন-ডায়েরি এক ইতিহাস। তিনি বর্তমানে কৃষক। হেলিকপ্টার ড্রাইভার থেকে মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু কৃষি-কারবার থেকে মুক্তি পাননি আজও। আবু বকর হোসেন আজাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য অকাতরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন। বিনা দ্বিধায় রক্তকে পানি করে পরিশ্রম করছেন।

আজাদ কবে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাবে! তাঁরা এখন যে হাসেন না তা নয়; তবে সেই হাসির আড়ালে থাকে ক্লান্তি আর জীবন-সংগ্রামের ছাপ। আজাদের হাসিতে তাঁরা সুখের হাসি দেন, তার দুঃখে ব্যথিত হন, কাঁদেন ও অশ্রু ঝরান।

আজাদের বাবা আবু বকর হোসেন জীবনের প্রথম দিন হতে সংগ্রামে। তিনি তাঁর মা-বাবা আর ভাই-বোনদের কষ্ট দূর করার জন্য জীবন-লড়াইয়ে নেমেছিলেন। পড়ালেখা তো দূরের কথা, নামটা লেখা পর্যন্ত শেখার সুযোগ হয়নি তাঁর। যার কারণে “ক” লিখতে গিয়ে কলম ভেঙে যায়, “খ” লিখতে গিয়ে খাতা ছিঁড়ে

ফেলেন। আর এখন আজাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য বাকি জীবন শেষ করে দিচ্ছেন। এর প্রতিদান তুমিই দিতে পারো, হে আল্লাহ!

আজাদ এখন বড় হয়েছে। বুঝতে শিখেছে, পড়তেও জানে। পড়ালেখার জন্য তাকে যশোরে পাঠিয়েছেন আবু বকর হোসেন ও রহিমা বেগম। এটি প্রাচীন ও প্রাণবন্ত এক নগরী। স্বাধীনতার বিজয়ী সূর্য প্রথম এই শহরে উদিত হয়। বললে ভুল হবে না যে, আজাদের যশোর-গমন যেন গোবরে পদ্মফুল ফোটার অপেক্ষা।

অনেকদিন পর আজ তাদের বিরতি হয়েছে। ছাত্রজীবনের অভিধানে কিন্তু 'ছুটি' নেই — আছে সাময়িক বিরতি। তাই আজাদ ও তার সহপাঠীদের মনের অজান্তে বের হচ্ছে —

আজ আমাদের বিরতি ভাই, আজ থেকে বিরতি,

পরিবারের সাথে মিলব আজই, কী যে আনন্দ কী যে খুশি।

আজাদ অনেকদিন পর আজ পরিবারের সকলের সাথে মিলবে। গল্প করবে, আড্ডা দেবে, আরও কত কী! মন এখনই আনন্দে আটখানা হয়ে আছে। বাস, লেগুনা, নৌকা আরও কত কী যোগে কত চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাড়িতে আসতে হয় তাকে। বাসযোগে বাড়ির দিকে রওনা হলো সে। কীভাবে বিরতির দিনগুলো কাটাবে — তার একটা নকশা মাথায় আঁকল আজাদ। নীল নকশা নয়, সবুজ নকশা। আশা-ভালোবাসার নকশা।

বাড়িতে পৌঁছে সর্বপ্রথম মা-বাবাসহ সকল মুরব্বিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, না করলে তাদের 'মান' হবে। আর মান ভাঙাতে নিজেকে অপমানিত হতে হবে। উফ! কত যে ঝামেলা — এটা আজাদের ভালো করে জানা আছে। তাই প্রথম সালামটা তাদেরকেই দিতে হবে। একবার সে বাড়িতে এসে পাড়ার বড় চাচা

হাশেম আলীকে — সালাম দেয়নি। ব্যস, হয়েছে! এতেই তিনি রীতিমতো বাড়িতে গিয়ে নালিশ করে দিয়েছেন। বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন বেচারাকে।

আজাদ তাদের অতি সাধারণ কুটিরে পৌঁছাল। পৌঁছাতেই সকলের সাথে সাক্ষাৎপর্ব শেষ করল। রহিমা বেগম ছেলেকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন — মায়ের সেই উষ্ণ আলিঙ্গনে অনেকদিনের দূরত্ব মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। আবু বকর হোসেন দূর থেকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন — যে হাসিতে ছিল পরিতৃপ্তির এক গভীর ছাপ। এখন থেকে শুরু হবে বিরতির দিনের কার্যাবলি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করা, সামান্য লেখাপড়া, টুকিটাকি মা রহিমা বেগম ও বাবা আবু বকর হোসেনের কাজে সহযোগিতা করা। মাঝে মাঝে হাত-খরচের জন্য কাজও করত সে।

আর প্রতিদিন বাদ আসর ঘুরতে বের হতো আজাদ। কখনো এ পথে, কখনো ও পথে। কখনো ঘাটে, কখনো বা আঁকাবাঁকা মেঠোপথে। ইছামতি বিলের রূপসী রূপ দেখা, আবার কখনো গ্রামের নৈসর্গিক পরিবেশের দৃশ্য অবলোকন করে — হারিয়ে যাওয়া দূর দিনে কাদামাটিতে, স্মৃতির পুরোনো ক্যানভাসে। আবার বড় মাঠে খেলাধুলা দেখতেও যাওয়া হতো মাঝেমধ্যে। সবকিছুই যেন মায়াতে বাঁধা, প্রীতিতে গাঁথা ও চিত্তরঞ্জক।

আজাদ খেলাধুলা দেখতে পছন্দ করে, খেলতে নয়। কেন জানি এসব তার সাথে যায় না। ছেলেবেলায় খেলাধুলা করত না সে — এটাও হয়তো একটা কারণ। রহিমা বেগম ও আবু বকর হোসেনের পক্ষ থেকেও মানা ছিল। তা এজন্য যে, অধিকাংশ সময় ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে — যা মাঝে মাঝে মারামারি পর্যন্ত গড়ায়। আর ঝগড়া-বিবাদ রহিমা বেগম ও আবু বকর হোসেন খুবই অপছন্দ করেন। তাই শৈশবে খেলাধুলা করেনি আজাদ। আর এখন যে পারে, তাও নয়! দেখেই আনন্দ উপভোগ করে। এ যেন শৈশবের আনন্দ, কৈশোরের বিনোদন।

মাঠে বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে আজাদের মনে পড়ল নিজের শৈশবের কথা। সে এভাবে কখনো খেলতে পারেনি। হয়তো সেজন্য অন্যের সাথে মিশতে একটু অস্বস্তি লাগে তার। সে ভাবল, এই বাচ্চাগুলো কত ভাগ্যবান। তারা জেনে গেছে এই ছোট্ট বয়সে যে, খেলাধুলা — বিশেষত গ্রামীণ খেলাধুলা — শিশুদের মেধার বিকাশ ঘটায়, শরীর-স্বাস্থ্যের অবকাঠামো ভালো করে, সুস্থ মস্তিষ্ক গঠনে সহযোগিতা করে, সকলের সাথে মিশতে শেখায়। শিশু ন্যায়-অন্যায়, নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝতে শেখে, অন্যদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে শেখে, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখায়, বিশ্বজয়ের আশা যোগায়। শিশুর এই আকাশছোঁয়া স্বপ্ন — যা ইতিহাস রচনা করতে ও তার ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল করতে সাহায্য করে।

একদিন আসরের নামাজের পরের কথা।আজাদ তাদের বাংলার সবুজ-শ্যামল নৈসর্গিক পরিবেশের ছোট্ট গ্রামটি দেখতে বের হয়েছে। সবুজে-ঘেরা এক সবুজ দ্বীপের কাঁচা পথ ধরে — আবার মাঝে মাঝে সরু বাঁকা পথ ধরে — হাঁটছে।হাঁটছে আর অনুভব করছে নির্মল, তাজা বাতাস — মন-মাতানো স্বর্গীয় আনন্দ। কতই না চমৎকার!

প্রতিপথে গ্রামের এক বড় ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো — রনি ভাই, পুরো নাম মো. রনি ইসলাম। সৌজন্য সাক্ষাৎ। এরপর আজাদ বলে—

আজাদ : ভাই, হিরোর মতো দাঁড়িয়ে আছেন! কোথাও যাবেন নাকি নায়িকার অপেক্ষায় আছেন? (মজা করে)

রনি ভাই : (হেসে) ধুর! এসব কী যে বলো? মাঠে খেলা আছে, তাই দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আজাদ: একটু হাঁটতে বের হয়েছি — এলাকাটা অনেকদিন দেখা হয়নি তো, তাই। তা কোন মাঠে খেলা? আমি কি যেতে পারি?

রনি ভাই : হ্যাঁ, অবশ্যই! আমি এমন লোকই তো খুঁজছিলাম। আর খেলা মেম্বারের বাড়ির পাশে। চলো!

আজাদ : জি, চলেন।কী খেলা হবে?

রনি ভাই: ভলিবল। খেলতে পারো?

আজাদ: না, ভাই। ফুটবল হলে চেষ্টা করতাম, ক্রিকেট হলে খেলতাম না। আর ভলিবল পারি না।

রনি ভাই: তোমাকে দিয়ে খেলাধুলা হবে না — আগেও করোনি, এখনও পারো না।

আজাদ: আরে ভাই, একটা কথা আছে —

'মন দিয়ে করো সবে বিদ্যার্জন, সকল ধনের চেয়ে বিদ্যা মহাধন,

এই ধন নাহি কেউ নিতে পারে কেড়ে, যতই করিবে দান ততই যাবে বেড়ে।'

এই কথামালা আমাকে পড়ালেখার প্রতি উৎসাহিত করে।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে এভাবে কথা বলতে বলতে হাঁটছে আজাদ ও রনি ভাই, উপভোগ করছে বসন্তের বাতাস দুজনে। পথের দুপাশে বৃক্ষরাজি, তালগাছের দীর্ঘ সারি — স্বাগত জানাচ্ছে, অভিবাদন জানাচ্ছে। রাস্তাটিকে বানিয়েছে আকর্ষণপূর্ণ। বৃক্ষের পাতার শোঁ শোঁ শব্দ উদাস মনের প্রফুল্লতার অভিনব আয়োজন। রাস্তার দুপাশে বিখ্যাত বিল ইছামতি — ফুলে-ফসলে ভরা এক সবুজ দেশের বদ্বীপের বিল। যেদিকে চোখ পড়ে সেদিকেই সবুজ আর সবুজতা — যেন সবুজের মিলনমেলা। মন উড়ে যায় পাখির মতো ইথারে-পাথারে।

দুর্বাঘাস মাড়িয়ে পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঠে পৌঁছাল তারা। রনি ভাই সকলের পরিচিত, তাই তাঁকে খেলা করার জন্য অনুরোধ করল সবাই। আজাদকেও খেলতে আমন্ত্রণ জানানো হলো — সে মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি প্রকাশ করল। সে সারিতে অবস্থান নিল। সে একেবারে আজনবী নয়, তাই পরিচিতদের সাথে কুশল বিনিময় করল।

মাঠে খেলা চলছে পুরোদমে — অপলক তাকিয়ে দেখছে আজাদ। হঠাৎ মাঠের এক পাশে নজর পড়ল, যেখানে কচিকাঁচা বাচ্চারা আপন মনে খেলাধুলা করছে, হইহুল্লোড় করছে। খুব মজা করছে, আনন্দ উপভোগ করছে — তাদের এই আনন্দ যেন তাকে শৈশবের অলিন্দে ফিরিয়ে নিচ্ছে।তাদেরই এই খেলাধুলা আজাদের ভালো লাগছে। আর সেও তাদের আনন্দে আনন্দিত হচ্ছে।

পরক্ষণে আজাদের দৃষ্টি ছুটল — না, না, দৃষ্টি আটকে গেল — এক কিশোরীর দিকে। সর্বসাকুল্যে ১৫ বছর বয়সী হবে। সে তার সখি-সাথীদের সাথে শান্তভাবে ক্ষীণ আওয়াজে খেলাধুলায় মত্ত। রূপে লাবণ্য অপরূপ — যেন স্বর্গীয় অপ্সরী। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, মুখে তার সর্বক্ষণ মুচকি হাসির আভাস। পাপড়ি ঝরিয়ে শিলাদানা বের করছে। কাজল-কালো যুগলদ্বয় তার মায়ার ফাঁদ। তার রেশমি কেশগুচ্ছ সৌন্দর্যেরই বহিঃপ্রকাশ।

আজাদ মনের অজান্তে আটকে গেছে তার মায়াজালে, মুচকি হাসির ডোরে। পড়ন্ত বিকেলের মিষ্টি রোদে, হালকা দক্ষিণা বাতাসে মেয়েটিকে আরও মিষ্টি লাগছে, সুন্দর লাগছে — তার হরিণী চাহনি তার হৃদয়ের গহিন কোঠায় করাঘাত করেছে। মনে জায়গা করে নিয়েছে। গ্রামের এই নন্দিনী যেন বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া। না, ঐশ্বরিয়াকে কেউ পিছে ফেলে দেবে। মজার ব্যাপার হলো — ভালোবাসার, ভালো

লাগার প্রিয় মানুষটি সুন্দরী হোক বা কুৎসিত, ধনী হোক বা গরিব — তার কাছে সে হয় বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া। আজাদের ব্যাপারটি তেমনই।

অবশেষে সূর্য জীর্ণ চাদরে আত্মপ্রকাশ করল। সবাই খেলাধুলা ছেড়ে স্বীয় দ্বারে ফিরতে লাগল। আজাদ মাগরিবের নামাজের জন্য মসজিদে গেল। নামাজ শেষে রনি ভাইয়ের সাথে গল্প করতে করতে বাড়ির দিকে ফিরল।

ততক্ষণে রাত দিনের আলো গ্রাস করে নিয়েছে। ফেরার পথে মাঝে মাঝে মেয়েটিকে মনে পড়তে লাগল — ততটা পাত্তা দিল না আজাদ। এভাবে চলে সময় গেল, একটা সময় আজাদ ঘুমের ঘোরে।

দ্বিতীয় দিন একই অবস্থা প্রায়। নামাজ শেষে রনি ভাই বললেন —

রনি ভাই: এই মিয়া! আজ যাবে নাকি? গেলে চলো, সময় কম।

আজাদ সম্মতি জানিয়ে তাঁর হাত ধরে রওনা হলো। ততক্ষণে মাঠে খেলা শুরু হয়েছে। রনি ভাই খেলোয়াড় হলেন, আজাদ আজও দর্শক। আপন মনেই খেলা দেখছে সে।

হঠাৎ কিছু অনুভব করল আজাদ। নিচু আওয়াজে, ক্ষীণ শব্দে, মিষ্টি কণ্ঠে কিছু ভেসে আসছে। হ্যাঁ — গতকালের সেই সুন্দরী নন্দিনীর আওয়াজ। তার মনে আহ্বান করছে। পেছন ফিরে দেখে সেই সুন্দরী তাকে এক নজরে দেখছে — পলকহীন নজর, যেন পলক পড়বেই না।

আজাদ চোখের কোণা দিয়ে আড়াআড়ি তার চেহারা দেখছে, মেয়েটির অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে। তার দিকে চেহারা ফেরায়নি — হয়তো সে লজ্জা পাবে। বিচক্ষণতায় সে বিষয়টি বুঝতে পেরে লজ্জা পেল। মুখে তার লজ্জা ফুটে উঠল।

এই অবস্থাতে তাকে আরও ভালো লাগছে। আস্তে আস্তে তার চেহারা রক্তিম আকার ধারণ করল। আজাদের মন তার প্রতি দোলা দিল। তার বাঁকা চাঁদের ফালির মতো হাসি আজাদকে আঘাত করল। তার সর্বাবস্থা যেন ছেলেটিকে পুলকিত করছে, তার কথা মুগ্ধ করছে, তার অন্যের সাথে কথা বলা আজাদকে ঘায়েল করছে।

সে কিছু সময় বাচ্চাদের সাথে থাকল। অতপর আগে আগে বাপের নীড়ে আপন দ্বারের দিকে রওনা দিল। তার প্রতিটি পদক্ষেপ আজাদকে মুগ্ধ করল, তার প্রতিটি কাজ অদ্ভুত প্রীতিকর, তার সবই ভালো লাগছে।

আজ সন্ধ্যার পূর্বে আজাদ বাড়ির দিকে রওনা হলো। রনি ভাইয়ের সাথে কোনো কথাবার্তা নেই। চুপচাপ হাঁটছে। তাই রনি ভাই বলে ফেললেন —

রনি ভাই: কী হলো? কিছু ভাবছিস?

আজাদ: না ভাই, এমনিতে কিছু ভালো লাগছে না। (মুখে বুলি — সব কথা বলা তো যায় না, বলতেও হয় না। একজন মহাপণ্ডিত বলেছেন, "তুমি যে কথা গোপন রাখতে চাও, তা দ্বিতীয় জনের কানে পৌঁছিও না, কেননা দেয়ালেরও কান আছে।")

মন শুধু মেয়েটির কথা ভাবছে। চোখের তারায় শুধু সেই ভাসছে — উঠতে বসতে সকল পদক্ষেপে তার মায়াবী চাহনি, কথার ভঙ্গিমা — সবকিছুই ভেসে উড়তে লাগল। যেন সে তার সামনে রয়েছে।

আর রাত কাকের পলকের মতো নবযৌবনা — আঁধার ছড়িয়ে দিল। রাত গভীর হলো। রাতের দীর্ঘতা তাকে তন্দ্রার প্রতি আবিষ্ট করল। একসময় হৃদয় আর চোখের পাপড়িদ্বয় মিলে গেল। আর চলে গেল ঘুমের রাজ্যে।

ঘুমের অপর নাম মৃত্যু, তাই ঘুমের দোয়ায় পড়া হয় —

اللهم باسمك اموت واحيا

(বুখারী ৬৩১৪)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং আপনার ঐ নামের সাথে জীবিত থাকব।

মৃত্যু যেমন সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়, তেমনি ঘুম। মৃত্যু যেমন সক্রিয় অঙ্গগুলো অকৃতকার্য করে দেয়, তেমনি ঘুম অঙ্গগুলো নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এই ঘুম কারো জন্য চিরদিনের ঘুম হয়ে যায়, আবার মানুষ এই ঘুমের মধ্যেও বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখে থাকে —

যাতে হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার পাতা থাকে, থাকে অনেক শিক্ষা আর শিক্ষার উপকরণ। কেননা শিক্ষা তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ধূলিকণা থেকে ধু-ধু শূন্যতায়ও। দিনের আলো, রাতের আঁধারেও। তাই এবারের আয়োজন স্বপ্ন নিয়ে কিছু কথা, কিছু ব্যথা।আজাদ স্বপ্ন দেখল-

ছুটিতে বাড়িতে আছে আজাদ। একদিন প্রভাত শেষে দিনের শেষভাগে, পড়ন্ত বিকেলে আসরের নামাজ আদায় করে দোকানের মাচালের উপর বসে আছে সে। দেখছে নীল আকাশের উচ্চতা। খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের মেলা, পাখ-পাখালির উড়ে চলা, মৃদুমন্দ বাতাসে নাচছে সবুজ বৃক্ষলতা। গাছের পাতা মালিকের জিকির করছে। এসব প্রকৃতির খেলায় মন ছোটাছুটি করছে।

পথিমধ্যে এক ভাই আজাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল — এই ভাই হলেন কামাল ভাই, পুরো নাম মো. কামালউদ্দিন। এলাকার পরিচিত মুখ, খেলাধুলায় বেশ দক্ষ।